উপসংহার

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব যুগপৎ গদ্যরচনা ও কবিতা রচনার মধ্য দিয়ে। পরবর্তী সময়পর্বে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের যত রচনা প্রকাশিত হয়েছে, সেইসব রচনার মধ্য দিয়ে যে রবীন্দ্রনাথকে আমরা পাই তিনি হলেন সৌম্যকান্ত এক ঋষি কবি, অগণিত ব্রহ্মসঙ্গীত রচনার মধ্য দিয়ে পরমব্রহ্মে সমর্পিত প্রাণ এক ভক্ত কবি। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পাতায় পাতায় শতধারায় উৎসারিত হয়েছে তাঁর অজস্র ব্রহ্মসঙ্গীত, যে সঙ্গীতগুলি পরবর্তীকালে গীতাঞ্জলি - গীতিমাল্য - গীতালি কাব্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। 'আত্মপরিচয়' নামক গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ''একটি মাত্র পরিচয় আমার আছে সে আর কিছুই নয় আমি কবি মাত্র।'' কবির এই ঘোষণারই সত্যকার রূপটি বিকশিত হয়েছে তত্ত্ববোধিনী পর্বে। ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের ব্যথা বেদনা থেকে উৎসারিত কোনো কোনো রচনা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় স্থান লাভ করেছে এই পত্রিকার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘকালের যোগাযোগের সূত্রে। যেমন - স্ত্রী বিয়োগের পর বিচ্ছেদকাতর কবি প্রাণের ব্যথা প্রকাশিত হয়েছে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ১৮২৪ শকাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় একটি কবিতা প্রকাশের মধ্য দিয়ে। এই কবিতাটি 'শেষকথা' নামে পরবর্তীকালে 'স্মরণ' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আবার 'অন্তর মম বিকশিত কর অন্তরতর হে' কবিতাটি প্রিয়পুত্র শমীন্দ্রনাথের অকাল প্রয়াণের বিয়োগ ব্যথা থেকে উৎসারিত হয়েছে। এমনভাবেই 'যাওরে অনন্তধামে দেহতাপ পাসরি' সঙ্গীতটি পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মহাপ্রয়াণের পর রচনা করেন।

একে একে পত্নী, কনিষ্ঠপুত্র এবং দুই কন্যাকে হারিয়ে স্নেহকাতর পিতৃহৃদয় একমাত্র পুত্র রথীন্দ্রনাথকে আঁকড়ে ধরেন, সেই মনোভাবই প্রকাশ করলেন 'যারা কাছে আছে তারা কাছে থাক' কবিতার মধ্য দিয়ে। পুত্র রথীন্দ্রনাথের সুরুলের বাড়ি ক্রয় ও লোকসান সংক্রান্ত সংবাদে কবি পিতার স্নেহমিশ্রিত বক্তব্য হল যে লোকসানের কথা ভেবে লাভ নেই বরং যেটুকু পাওয়া গেছে তাই স্বেচ্ছায় নিতে হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে রচনা করলেন 'কে নিবি গো কিনে আমায়' গানটি। রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি তাই তাঁর

ব্যক্তিগত আবেগ অনুভূতি প্রতিনিয়ত গান ও কবিতা রচনার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

অপরদিকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা আদি ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র বলে এই পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের একটিও উপন্যাস বা ছোটোগল্প কিংবা নাটক প্রকাশিত হয়নি। ধর্মীয় অনুষঙ্গের পত্রিকা বা ধর্মীয় সভার মুখপত্র বলেই হয়তো সর্বদা মনে রেখেছেন, যাতে কোনোভাবেই কোনো রকম লঘু রচনা প্রকাশের দ্বারা পত্রিকার আভিজাত্য এবং ধর্মীয় গাম্ভীর্য ব্যাহত না হয়। বরং আদি ব্রাহ্মসমাজের ৭ই পৌষের উৎসব এবং ১১ই মাঘের উৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ যেসব ভাষণ দিয়েছেন সেগুলি নিয়মিতভাবে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের আচার্যরূপে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে ৭ই পৌষের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন এবং বিনম্র চিত্তে স্মরণ করেছেন ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপনের পিছনে দেবেন্দ্রনাথের অবদানের কথা, তাঁর উৎসাহ অনুপ্রেরণা কথা। এই সব ভাষণ, বক্তৃতা ও উপদেশের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের ধ্যানগম্ভীর ঋষিকল্প রূপেরই প্রকাশ ঘটেছে। তবে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনায় ধর্মীয় অনুষঙ্গ ছাপিয়ে প্রাধান্য পেয়েছে সমকালীন সমাজ, ইতিহাস, শিক্ষা এবং রাজনৈতিক প্রসঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক হবার পর 'প্রচার' নামক পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দুধর্ম বিষয়ক প্রবন্ধের বিরোধিতা করে 'রামমোহন রায়' প্রবন্ধ রচনার মধ্য দিয়ে ব্রহ্মের মাহাত্ম্য যেমন প্রচার করেন, তেমনি পরবর্তী সময়ে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে সাড়া দিয়ে প্রায় প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ে অন্যান্য আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পথে নেমেছেন, বিভিন্ন সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের হাতে রাখী পরিয়েছেন, স্বতোপ্রণোদিত হয়ে গান বেঁধেছেন এবং গেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ধর্ম সম্পর্কে যেমন সচেতন ছিলেন তেমনি স্বদেশ সম্পর্কেও তাঁর সচেতনতার অভাব ছিলনা। এতেই বুঝতে পারি যে রবীন্দ্রপ্রতিভা কত বিচিত্র আর কত বিস্ময়কর। রবীন্দ্রনাথ এমন এক ব্যক্তিত্ব যাঁর সম্পর্কে যতই বলা যাবে ততই বলার প্রবণতা বাড়বে, বলার যেন আর শেষ হবে না। আসন্ন বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বলাকার কাব্যের অন্তর্গত 'শঙ্খ' কবিতার মধ্য দিয়ে। ১৯১৪ সালে প্রথম

বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়। তার আগের বছর অর্থাৎ ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলি কাব্য রচনা করে বিশ্বের সর্বোচ্চ সেরা সম্মান নোবেল পুরস্কার পান। ১৯১৪ সালেই আবার প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'সবুজপত্র'-এ 'সবুজের অভিযান' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ তরুণদের জয়গান করেন, তরুণ সমাজকে জেগে উঠবার আহ্বান জানান। পরবর্তীকালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে বিশ্বব্যাপী হানাহানির বিরুদ্ধে রবীন্দ্র ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত 'মা মা হিংসীঃ' প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে।

এতসবের মধ্যেও পিতা রবীন্দ্রনাথ তাঁর কর্তব্য থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হননি। তাই পুত্র রথীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বছরের জন্মদিনে আশীর্বাণী ব্যক্ত করেছেন কবিতা রচনার মধ্য দিয়ে। বালক বয়স থেকে শুরু করে কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্য বিভিন্ন বয়সের রবীন্দ্র মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মধ্য দিয়ে, যেখানে রবীন্দ্রনাথের সার্বিক পরিচয়ের উর্ধ্বে ফুটে উঠেছে তাঁর কবিসত্তার পরিচয়। আদি ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবে গাইবার জন্য রবীন্দ্রনাথকে যেমন অনেক ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করতে হ'ত, তেমনি উৎসবে সেই সব স্বকীয় রচনা নিজকণ্ঠে পরিবেশনও করতে হ'ত। এমনিভাবে প্রতি ১১ই মাঘের ব্রহ্মোৎসবে গাইবার জন্যও অসংখ্য ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করেছেন এবং পরিবেশনও করেছেন। এইসব রচনাই ধারাবাহিকভাবে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার বিচিত্র আস্বাদের পরিচয় পাওয়া যায়। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত ব্রহ্মসঙ্গীত -সাম্বৎসরিক উৎসব - ব্রহ্মোৎসব - রবীন্দ্রনাথ একে অপরের পরিপূরক হয়ে এক অখণ্ড সত্তার প্রতীক হয়ে উঠেছে।